

প্রফেসর মো. শাহজাহান

শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে প্রত্যাশা

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য অজানাকে জানা, জানা জিনিসটিকে বুঝে বাস্তবে প্রয়োগ করে নিজের কার্যসিদ্ধ করতে পারা এবং আজ যেভাবে কার্যসিদ্ধ করল আগামী দিনে আরও সফলতার সঙ্গে করার যোগ্যতা ও দক্ষতার অধিকারী হওয়া। অর্থাৎ জ্ঞান আহরণ এবং তার উৎকর্ষ সাধনই শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এটিকে শিক্ষার সর্বজনীন উদ্দেশ্য ধরে নিয়ে দেশের প্রেক্ষাপটে জাতীয়ভাবে নির্ধারিত শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য তালিকা করা যেতে পারে।

বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক—এ তিন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত রয়েছে। এখানে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রসঙ্গটি টেনে এনে জাতীয়ভাবে নির্ধারিত শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সর্বসাধারণের পরিচয় ঘটানো যায়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা মূলত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে। বর্ণিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ শিক্ষাধারার অন্তর্গত। এ সাধারণ শিক্ষাধারা আবার বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি থেকে ঊষ্ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার স্তর, নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি হচ্ছে মাধ্যমিক স্তর (জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুসারে)। এর পরের স্তর হচ্ছে উচ্চশিক্ষা স্নাতক পাস ও সম্মান এবং স্নাতকোত্তর এ দুটো পর্যায়েক্রমিক ধাপে বিভক্ত রয়েছে।

প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করে এখানে সাধারণ শিক্ষাধারার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের জন্য জাতীয়ভাবে নির্ধারিত শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য বিধৃত করার মধ্যে আলোচনা কেন্দ্রীভূত রাখা যায়। সাধারণ শিক্ষাধারার প্রথম ধাপ বা স্তর হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। শিক্ষার এ স্তরে পরবর্তী সব স্তরে প্রবেশের ভিত্তি তৈরি হয়। এর পরবর্তী মাধ্যমিক স্তরটিকে জীবনের প্রবেশদ্বার (Gate way of life) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কর্মজীবনে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জন করে। ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের জাতীয়ভাবে নির্ধারিত শিক্ষার মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের মধ্যে যোগসূত্র থাকলেও কিছুটা ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কিংবা পরিমার্জন প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কর্তৃক নির্ধারিত হয়। এনসিটিবি সমকালীন জীবনের চাহিদা, পরিবর্তিত জাতীয় ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি, বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতি, জনগণের চাওয়া-পাওয়া এবং বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সমন্বয় করে রাষ্ট্রীয় সংবিধান এবং সরকারের গৃহীত নীতি ও কর্মসূচির আলোকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য প্রস্তাব আকারে তৈরি করে। এ প্রস্তাবনা জাতীয়ভাবে গঠিত কমিটির (এনসিসিসি) সুপারিশপ্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে অনুমোদন লাভের মাধ্যমে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।

জাতীয়ভাবে সর্বশেষ নির্ধারিত প্রাথমিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে— শিশুর কল্পনাশক্তি জাগিয়ে তোলা, শেখার প্রতি তাদের ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করা এবং উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা। আর মাধ্যমিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে— শিক্ষার্থীদের সুস্থ প্রতিভা ও সম্ভাবনা বিকাশের মাধ্যমে তাদের দক্ষ ও মানবীয় গুণাবলিসম্পন্ন দেশপ্রেমিক শিক্ষার জন্য গৃহীত শিক্ষাক্রমে বর্ণিত বহুসংখ্যক

মনোভাব অর্জন ও পরমতসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতে পারবে, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুশীলন করতে বাংলাদেশকে জানবে ও ভালবাসবে ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। একইভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এ শিক্ষা শেষে, বিশেষ করে নবম ও দশম শ্রেণির পাঠশেষে শিক্ষার্থীরা সব ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগ রক্ষায় প্রমিত বাংলা ভাষায় বলতে ও লিখতে পারবে, কর্মক্ষেত্রে কিংবা উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার মৌলিক দক্ষতা (পড়া, লেখা, শোনা ও বলা) প্রয়োগ করতে পারবে, জীবনঘনিষ্ঠ কোনো সমস্যা অনুসন্ধান ও সমাধানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারে সক্ষম হবে,



উদ্দেশ্যকে সারসংক্ষেপ আকারে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিটি স্তরের জন্য নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলোকে বহুসংখ্যক প্রান্তিক যোগ্যতা এবং এরই ধারাবাহিকতায় আচরণিক উদ্দেশ্যে (শিখনফল-এ) ভেঙে দেখানো হয়েছে। তাতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাশেষে শিক্ষার্থীরা কী কী গুণ যোগ্যতা ও দক্ষতার অধিকারী হবে, তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সর্বশেষ পরিমার্জিত প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এ শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা যৌক্তিক চিন্তার মাধ্যমে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে জানবে এবং ব্যবহারে সক্ষম হবে, বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে পারবে, বাংলা ভাষায় কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে, অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমে ত্যাগের

নেতৃত্বদানে সমর্থ হবে, মানবতাবোধ, দূরদর্শিতা, সহানুভূতি, দেশপ্রেম, মানুষের প্রতি আত্মতা ও শ্রদ্ধাবোধ ইত্যাদি গুণের অধিকারী হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাগ্রহণ শেষে প্রত্যাশিত ওই সব গুণ শিক্ষার্থীরা কে কতটা অর্জন করল তা বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে নানাবিধ কাজ (কোর্স ওয়ার্ক), সাময়িক পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হলেও তা কিন্তু শিক্ষার্থীর প্রেত নির্ধারণে বিবেচনা করা হয় না। শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব কিংবা পারদর্শিতার একমাত্র মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায় শিক্ষার কোনো একটি স্তরশেষে অনুষ্ঠিত পাবলিক পরীক্ষার কৃত্রিম মূল্যায়নের পর ঘোষিত ফলাফলের ভিত্তিতে। যেহেতু পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা বিচারের একমাত্র মাপকাঠি, সেহেতু জাতীয়ভাবে প্রত্যাশিত দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন অপেক্ষা পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর লেখার ক্ষেত্রে

শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা বৃদ্ধির ওপর জোরটা পড়বে বেশি। তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণির শিখনফল জরিপে দেখা গেছে, পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের স্কোর বেশি। ১১ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রত্যাশিত গাণিতিক দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হচ্ছে। অথচ পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষার (পিএসসি) ফলাফলে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা শিখনফল অর্জনের হারের সঙ্গে মিলছে না। মাধ্যমিক শিক্ষার মান যাচাই জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, শিক্ষার্থীদের ২৫ থেকে ৫০ শতাংশ মাতৃভাষা ও গণিতে দুর্বল, ইংরেজিতে আরও বেশি দুর্বল (দৈনিক প্রথম আলো, ৯/১১/২০১৬ সংখ্যা)। ভাষা, গণিত ও সাধারণ জ্ঞানে বয়সের তুলনায় শিক্ষার্থীদের মান অনেক কম। তাতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় স্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে নির্ধারিত যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন অনেকাংশে ব্যাহত হচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তে দেখা যায়, পরীক্ষাকে ঘিরেই বিদ্যালয়গুলোয় পড়াশোনার আয়োজন চলছে। অনেক ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জ্ঞানের চর্চা ও প্রয়োগের কার্যাবলি কাটছাট করে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে পরীক্ষাবান্ধব ব্যবস্থা ইতোমধ্যে দাঁড় করিয়েছে। তাতে নানা মডেল টেস্ট গ্রহণ করা, সরকার নির্ধারিত একটি সাময়িক পরীক্ষা (শিক্ষাদানের ছয় মাসের মাথায়) এবং বছরশেষে বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়ার বিধান না মেনে তিনটি পরীক্ষা গৃহীত হচ্ছে। স্কুলগুলো কে কার চেয়ে পাঠ্যসূচি বড় করে দেখাতে পারে, কত বেশি হোমওয়ার্ক শিক্ষার্থীদের দেওয়া যায় ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছে। অভিভাবকদের অনেকের ধারণা, পড়া চাপিয়ে দিলে বা পড়ার জন্য বেশি বেশি চাপ দিলে শিশু তা শেষ করতে পারবে। তাতে শিশুর যে মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে, শিশু স্ব-প্ররোচিত হয়ে শেখা ও সৃষ্টির আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, সেদিকে অনেকে বেখেয়াল। এসবই পরীক্ষাকেন্দ্রিক পড়াশোনার চালচিত্র। ফলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। অন্যভাবেও বলা যায়, শুধু লিখিত পরীক্ষা নিয়ে জাতীয়ভাবে নির্ধারিত শিক্ষার অনেক উদ্দেশ্য যাচাই বা পরিমাপ করা যাবে না, বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে (Course work) তা করতে হবে। এখনো পর্যন্ত পরীক্ষাকেন্দ্রিক কৃত্রিম মূল্যায়নের ওপর যেহেতু নির্ভরতা, সেহেতু নির্বিধায় বলা যায় এর দ্বারা জাতীয়ভাবে নির্ধারিত শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য পরীক্ষার ফাঁদে আটকে আছে। এটা ছিন্ন করতে না পারলে শিক্ষার অস্তিত্ব লক্ষ্য-মানবিক গুণসম্পন্ন ও আলোকিত মানুষ তৈরির পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে পড়বে।

□ প্রফেসর মো. শাহজাহান : প্রাক্তন বিশেষজ্ঞ এনসিটিবি